মার্কসীয় ধারার অবদান কম নয়।

২.১৪ নারীবাদ কী?
What is Feminism ?

বর্তমান দিনে নারীবাদ তথা নারীবাদী আন্দোলন নিয়ে সচেতনতা যেমন বেড়েছে, তেমনি এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা, লেখালেখিও যথেষ্ট হচ্ছে। কিন্তু 'নারীবাদ' বলতে ঠিক কী বোঝায় এ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, **নারীবাদ হল এমন একটি শক্তি যা নারীজাতিকে একটি আত্মসচেতন সামাজিক শ্রেণিতে পরিণত করেছে** ("Feminism is the force which has transformed women into self conscious social category."—Bandana Chatterji, *Women & Politics in India*)।

বাসবী চক্রবর্তীর মতে, "নারীবাদ হচ্ছে মূলত নারীমুক্তির জন্যে কিংবা নারীর সমানাধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা তত্ত্ব এবং একই সঙ্গে তার প্রয়োগ ও দৃষ্টিভঙ্গি। নারীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে নারী তার নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।" (বাসবী চক্রবর্তী, 'নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা', প্রসঙ্গ মানবী বিদ্যা, পৃষ্ঠা ৩৮)। অপর এক নারীবাদী লেখিকা **রাজশ্রী বসুর** মতে, নারীবাদ

Scanned with CamScanner

হল তত্ত্ব ও বাস্তবের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর নিম্নতর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে এবং 'নারী' হওয়ার কারণেই একজন মহিলা সমাজে যে অসাম্যের শিকার হয়, তার কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। শ্রীমতী বসু আরো বলেন, নারীবাদীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক চিন্তা, মূল্যবোধ, অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা বলেন যাতে নারীর লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অবসান ঘটে। সমাজকে বোঝা, সমাজে নারী পুরুষের অবস্থাগত বৈষম্যকে বোঝা, লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতার অসম বণ্টন ও বিন্যাসকে অনুধাবন করা এবং কীভাবে এর সমাধানসূত্র খুঁজে বার করা যায়—এই সমস্ত কিছু নিয়েই নারীবাদ চর্চা করে।

এই নারীবাদ নারীকে এমন একটা জায়গায় দাঁড় করাতে চায় যেখানে সে নিজের সত্তাকে খুঁজে নিতে পারে। নারীবাদ একাধারে রাজনৈতিক দর্শন এবং সামাজিক আন্দোলন, যা লিঙ্গবৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চায়। এককথায় বলা যায়, নারীবাদ হল এমন একটি প্রত্যয় যেখানে নর অথবা নারী যে-কোনো মানুষের প্রকৃতি ও যোগ্যতা বিচারে লিঙ্গের কোনো ভূমিকা নেই ("In its essence it [feminism] is the belief that the nature and worth of a human being, man or woman, should be independent of gender.")।

২.১৫ বিশ্বের নারীবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ
The origin and development of Feminist Movements in the world

বিশ্বে নারী আন্দোলনের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। সাবেকি রাজনৈতিক তত্ত্ব বা আলোচনায় লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। সরকারিভাবে নারী আন্দোলনের সূচনা হিসেবে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ, বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবকে চিহ্নিত করা হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু নারীবাদী প্রবন্ধ ও রচনা পাওয়া গেলেও ফরাসি বিপ্লবকেই (১৭৮৯) নারীবাদী আন্দোলনের সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করা হয়। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী সেখানকার মহিলাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। নিজেদের পারিবারিক জীবনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়টিকে তাঁরা আন্দোলনের সামগ্রিক 'স্বাধীনতা'র স্লোগানের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী মহিলারা শুধুমাত্র রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে তাঁরা পিতৃতন্ত্রের অবসান ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরব হন।

ফরাসি বিপ্লব সফল হল, কিন্তু মহিলাদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেল। ১৭৯১ সালের নতুন সংবিধানে পুরুষদের সীমিত ভোটাধিকার স্বীকার করা হল, কিন্তু মহিলাদের বঞ্চিত করা হল। এ ছাড়া নবগঠিত ফরাসি সংসদে 'পুরুষদের অধিকারের ঘোষণাপত্র' (Declaration of the Rights of Man) গৃহীত হল। এই ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ফরাসি মহিলারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সরকার কড়া হাতে এই আন্দোলনকে দমন করে। প্রসঙ্গত, **মাদাম গুৎজ** নামক এক মহিলা বিপ্লবী দাবি করেন, নারীদের যদি ফাঁসিতে যাওয়ার অধিকার থাকে, তাহলে তাদের সংসদে যাওয়ার অধিকার থাকবে না কেন? এই প্রতিবাদের পরিণতিতে মাদামকে সংসদের পরিবর্তে ফাঁসি কাঠেই যেতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভলতেয়ার, রুশো, দিদেরো, মন্তেস্কু প্রমুখ এই সময়ের বিখ্যাত দার্শনিকদের দর্শন ও রচনায় নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। নারীকে তাঁরা ভাবাবেগের আধার হিসেবে, মাতা, কন্যা, স্ত্রী-র সার্থক ভূমিকা পালনকারী হিসাবে দেখেছেন, কিন্তু তারাও যে পুরুষের মতো যুক্তিবাদী চিন্তা করতে সক্ষম, তাদেরও যে যুক্তিবাদী মনন আছে, একথা এইসব দার্শনিক মনে করতেন না। এই প্রেক্ষাপটে **মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট** (Mary Wollstonecraft) নামক এক ফরাসি মহিলা *Vindication of the Rights of Women' (1792)* নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেন, সমসাময়িক তথা উত্তরকালের নারীবাদীদের তা ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। বস্তুত এই গ্রন্থটির মধ্য দিয়েই উদারপন্থী নারীবাদের সূত্রপাত ঘটে।

ফরাসি দেশের নারীবাদী আন্দোলনের ঢেউ ক্রমশ ইউরোপের অন্যান্য দেশে পৌঁছে যায়। ১৮৩০ সালে ইংল্যান্ডের নারীরা বেশ কিছু দাবির ভিত্তিতে **'চার্টার অব্ ডিম্যান্ডস'** পেশ করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। এরই পাশাপাশি বিশ্বের আর এক ধনতান্ত্রিক দেশ **আমেরিকাতে** নারীদের বৈপ্লবিক ভূমিকার এক অভূতপূর্ব আত্মপ্রকাশ ঘটে

Scanned with CamScanner

১৮৫৭ সালের ৮ মার্চের ধর্মঘটে। ১৯১০ সালে **ডেনমার্কের কোপেনহাগেন**-এ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৭টি দেশের একশত নারী প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং বিশ্ববরেণ্য নেত্রী **ক্লারা জেটকিন** ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত নারী সংগঠনগুলি এই দাবিকে সমর্থন জানায়। অবশেষে ১৯১৪ সাল থেকে ৮ মার্চকে **আন্তর্জাতিক নারীদিবস** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সর্বত্র শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের প্রকাশ ঘটতে থাকে। বিশের দশকে নারীদের আইনগত অধিকার দাবি করে অনেক নারীবাদী লেখিকার লেখনী গর্জে উঠেছিল। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন **ভার্জিনিয়া উলফ্, সুজান সায়লেট্‌স** প্রমুখ।

প্রথম পর্বের নারীবাদী আন্দোলনগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও বর্তমান দিনের কোনো নারীবাদী ওই পর্বের আন্দোলনগুলির কিছু **সীমাবদ্ধতার** প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের মতে ওইসব আন্দোলনের প্রত্যেকটি ছিল **ইস্যু-ভিত্তিক এবং সীমিত প্রকৃতির**। কখনও নারী-পুরুষের সম-মজুরির দাবিতে, কখনও নারীদের ভোটাধিকারের দাবিতে, কখনও নিরাপদে গর্ভপাতের দাবিতে, কখনও বা বিবাহ-বিচ্ছেদকে আইনসঙ্গত করার দাবিতে ওইসব আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। বর্তমানের নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, একটি বা কয়েকটি বিশেষ দাবি মিটে গেলেই নারী নির্যাতন বা লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসান ঘটবে না। এরজন্য দরকার প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন, নারীর প্রকৃতি সম্পর্কিত সাবেকি ধ্যানধারণার পরিবর্তন, প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন। এই ধরনের মৌলিক পরিবর্তনকে লক্ষ্য রেখে বিশ শতকের ৬০-এর দশক থেকে নারী আন্দোলন এক নতুন মোড় নেয় ; শুরু হয় নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব।

নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব :

নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয় ১৯৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে **বেটি ফ্রায়ডান-এর** *Feminist Mystique* নামক গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই পর্বে নারী আন্দোলন জটিলতর রূপ ধারণ করে। আগের আন্দোলনগুলি যেখানে মূলত সংস্কারপন্থী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল, দ্বিতীয় পর্বের আন্দোলনগুলি সেখানে যৌথ ও বৈপ্লবিক প্রকৃতির ছিল। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে **শীলা রোবথাম** (Sheila Rowbotham) বলেন, "এই পর্বের নারী আন্দোলনে পুরনো নারীবাদের সমানাধিকারের দাবি তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরো অনেক কিছু। এই পর্বের আন্দোলন হল পরিবর্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলশ্রুতি এবং এই পর্বের আন্দোলনে নারী সচেতনতা ছিল অনেক বেশি তীব্র ও বৈপ্লবিক।"

বিশ শতকের ৬০-এর দশকের আগে পর্যন্ত নিজেদের বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নারীবাদ একটি মতাদর্শ হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। সমকালীন চিন্তাজগতে নারীবাদকে উদারনীতিবাদ অথবা সমাজতন্ত্রবাদের একটি উপধারা হিসাবে গণ্য করা হত। নারীবাদের দ্বিতীয় পর্বে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের উদ্ভবের সাথে সাথে এই ধরনের পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মতে, সমাজের মূল দ্বন্দ্বটি হল লিঙ্গভিত্তিক দ্বন্দ্ব। তাঁদের মতানুসারে লিঙ্গ (Gender) হল অত্যন্ত গভীর ও রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এঁদের কাছে সামাজিক শ্রেণি, জাতি ও ধর্মের মতো লিঙ্গও হল সামাজিক বিভাজনের (Social cleavage) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সনাতন রাজনৈতিক তত্ত্বে সমাজে লিঙ্গগত বৈষম্যের বিষয়টিকে কখনোই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়নি। পক্ষান্তরে, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের বক্তব্য হল এই সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে লিঙ্গগত বৈষম্য ও পীড়নমূলক ব্যবস্থার ভিত্তিতে। **ইভা ফিগস্, জারমেইন গ্রিয়ার, কেট মিলেট** প্রমুখ দ্বিতীয় পর্বের নারীবাদীদের মতে, ধর্ম, নৈতিকতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সমাজের সর্বস্তরে পিতৃতন্ত্র পরিব্যাপ্ত, যা নারীকে ক্ষমতাহীন ও মর্যাদাহীন করেছে। **কেট মিলেট** তাঁর *Sexual Politics* (1969) গ্রন্থে বলেছেন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি প্রতিষ্ঠান হিসোবে কাজ করে। তিনি রাজনীতির সাবেকি সংজ্ঞাকে উপেক্ষা করে বলেন, 'Personal is Political' অর্থাৎ ব্যক্তিগত পরিসরও রাজনীতির অঙ্গ। পরিবারের মধ্যে যে লিঙ্গবৈষম্যের সূত্রপাত ঘটে, বৃহত্তর সমাজজীবনে তা পরিব্যাপ্ত থাকে। তাই র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা প্রাত্যহিক জীবনের রাজনীতির বিচার-বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী।

Scanned with CamScanner

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মধ্যে একটি অংশ আবার **সমকামিতাকে** সমর্থন করেছেন। বলা হয়েছে, নারীর সঙ্গে নারীর মানসিক ও যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যকে খর্ব করা যেতে পারে। **অ্যাড্রিয়েন রিচ** (Adrien Rich) তাঁর *Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence* (1980) শীর্ষক প্রবন্ধে সমকামিতাকে সমর্থন করে বলেছেন, অসমকাম হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এক বাধ্যতামূলক যৌনতা, যা প্রতিটি মেয়ে কখনোই মানতে বাধ্য নয়। অন্যদিকে সমকামী মেয়েদের অস্বাভাবিক বা অসুস্থ বলে প্রচার করার মধ্যে আছে পিতৃতন্ত্রের একধরনের কৌশল।

নারী আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব : ১৯৯০ এর দশক থেকে নারীবাদী আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব বা ঢেউ (Third wave of Feminism) শুরু হয়। নারীবাদের দ্বিতীয় পর্ব নারীর অধিকার ও লিঙ্গজনিত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। তাই নারীবাদের তৃতীয় পর্ব বা ঢেউ গড়ে ওঠে। এই তৃতীয় পর্বকে অনেক সময় উত্তর-নারীবাদ (Post feminism) বলেও চিহ্নিত করা হয়। এই পর্বের নারীবাদ যে সমস্ত রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ হয় সেগুলি হল : নাওমি উলফ-এর *'The Beauty Myth: Images of Beauty are Used Against Women'* *(1991)*, সুসান ফালুডি-র *'Backlash : The Undeclared War Against American Women'* (1991) ইত্যাদি।

তৃতীয় পর্যায়ের নারীবাদ উত্তর-কাঠামোবাদী আলোচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্ষুদ্র রাজনীতির (Micro-politics) ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই পর্যায়ের নারীবাদে যৌনতা, মনস্তাত্ত্বিক শোষণ, কর্মক্ষেত্রে যৌন উৎপীড়ন প্রভৃতি বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। তৃতীয় পর্বের নারীবাদের সূত্রপাত ঘটে ১৯৯১ সালে **রেবেকা ওয়াকার** কর্তৃক প্রণীত *Becoming the Third Wave* নামক প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে। এই পর্যায়ের নারীবাদ যে সমস্ত তাত্ত্বিকের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁরা হলেন **শেলা স্যান্ডোভাল, বেল হুকস, গ্লোরিয়া আনজালডুয়া, চেরি মোরাগা ইত্যাদি**। এই পর্বের নারীবাদের একটি বৈশিষ্ট্য হল অল্পবয়সী মহিলাদের অংশগ্রহণ।

সাম্প্রতিককালে নারীবাদের একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে **ধর্মসম্পর্কিত নারীবাদ** আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ধরনের নারীবাদে ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় প্রথা, রীতিনীতি বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং লিঙ্গজনিত সাম্যের প্রেক্ষিতে বিষয়গুলিকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে **পামেলা অ্যান্ডারসন-এর** *A Feminist Philosophy of Religion, The Rationality and Myths of Religious Belief (1998)* এবং **গ্রেস জান্টজেন**-এর *Becoming Divine : Towards a Feminist Philosophy of Religion* (1999) বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এইসব নারীবাদীর বক্তব্য হল, ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর আসলে পুরুষের কণ্ঠস্বর যা নারীকে বদ্ধ ও বন্দি রাখতে সাহায্য করে। তাঁরা দেখিয়েছেন, বিশ্বের সব ধর্মের মধ্যে কমবেশি পুরুষ কেন্দ্রিকতা ও পিতৃতান্ত্রিকতার উপাদান নিহিত রয়েছে।

২.১৬ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও নারীবাদ
Feminism and International Politics

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে লিঙ্গভিত্তিক আলোচনা খুবই সাম্প্রতিক ঘটনা বলা যায়। কিছুদিন আগেও আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনায় বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কর্মকাণ্ডে নারীরা ভীষণভাবেই উপেক্ষিত ছিল। কারণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বরাবরই একটি পুরুষশাসিত বিষয় বলে গণ্য করা হয়েছে। সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে করা হত, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি উচ্চ রাজনীতির (High Politics) জায়গা, যেখানে যুদ্ধ, কূটনীতি, রণকৌশল প্রভৃতি জটিল বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। যেখানে সংবেদনশীলতা, নম্রতা, সারল্য, আবেগপ্রবণতা প্রভৃতি নারীসুলভ গুণাবলির কোনো স্থান নেই। আরো মনে করা হয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্ব পায় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, বাহুবল, ছল-চাতুরি, রেষারেষি, নীতিহীনতা ইত্যাদি, যেখানে একান্তভাবেই পুরুষকে মানিয়ে যায়, স্ত্রীলোককে নয়। কেউ কেউ বলেন, ক্ষমতা ও কূটকৌশল নির্ভর আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে প্রভাবিত করতে হলে যে গুণাবলির প্রয়োজন তা একান্তভাবেই পুরুষালি। জাতীয় স্বার্থ, যুদ্ধ, সংঘর্ষ প্রভৃতি নির্ভর আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে বাস্তববাদী তত্ত্বে (Realism), সেই বাস্তববাদ এই পুরুষতান্ত্রিক ধারণাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।

Scanned with CamScanner

মহিলাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে দূরে রাখার এই প্রবণতা থেকে পৃথিবীর কোনো দেশই মুক্ত নয়, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি উন্মুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাতে আমরা দেখি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষদের একচেটিয়া প্রাধান্য। পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারি, ১৯৮৭ সালে মার্কিন বিদেশ দপ্তর এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরে যথাক্রমে ৫ ও ৪ শতাংশ উচ্চপদস্থ মহিলা ছিলেন। শুধু তাই নয়, এইসব ক্ষেত্রে যে স্বল্প সংখ্যক মহিলা উচ্চপদে আসীন ছিলেন, তাঁরা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের কাছে থেকে উপযুক্ত বা প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা পান না। নিজের যোগ্যতার সুবাদে ১৯৮১ সালে জাতিপুঞ্জের মার্কিন দূত হিসেবে নিযুক্ত হওয়া কারপ্যাট্রিক (J Kirpatrick) অভিযোগ করেন যে, তিনি তাঁর কাজে মার্কিন বিদেশ দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাননি।

তবে বর্তমানে, বিশেষ করে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর থেকেই এই অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীশক্তি তথা নারীবাদী চিন্তাধারাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। এই বৌদ্ধিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বেশ কিছু অগ্রণী ও প্রতিষ্ঠিত মহিলার নিরলস প্রচেষ্টার ফলে। অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু কৃতবিদ্য পুরুষেরও অবদান রয়েছে। এ ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকাও কম নয়। ১৯৭৫-৮৫-র দশককে আন্তর্জাতিক মহিলা দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং নারীবাদকে তত্ত্বের গণ্ডি থেকে বেড়িয়ে বাস্তবের কঠিন মাটিতে পা রাখতে সাহায্য করেছে। বর্তমানে বহু মহিলা মহিলাদের ক্ষমতায়ন নিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি করার কাজে নিযুক্ত আছেন এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মহিলারা এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠন গড়ে তুলেছেন, সভা-সমিতি-কনফারেন্স ইত্যাদির আয়োজন করছেন। নারীবাদী পত্রিকা, গ্রন্থ ইত্যাদি প্রকাশ করছেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের ন্যায্য দাবিকে তুলে ধরার পিছনে বহু ব্যক্তির নাম চলে আসে। তবে আলাদা করে **টিকনার** (J A Tickner)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পেশায় শিক্ষিকা এই মহিলা বর্তমান পৃথিবীর নারীবাদী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর বহু মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটির নাম করা যেতে পারে—1. *Gendering World Politics : Issues and Approach in Post Cold War Era*, 2. *Feminism and International Relations* ইত্যাদি। টিকনার আরো কয়েকজন মার্কিন বিশিষ্ট মহলিাকে সঙ্গে নিয়ে 'ফোর্ড ফাউন্ডেশন'—এর কাছে জোরালো আবেদন রাখেন নারীবাদ নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক স্তরে কনফারেন্সের আয়োজন করতে। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৮৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েলেসলি কলেজে (Wellesley College, Massachusetts) মহিলা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনার থেকে একগুচ্ছ মৌলিক লেখা বেরিয়ে আসে, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

টিকনার এবং আরো কিছু বিশিষ্ট মহিলার উদ্যোগে International Studies Association (ISA) নামক একটি আন্তর্জাতিক ফোরাম গঠন করা হয়, যার কাজ হল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মহিলাদের আত্মসচেতন ও শিক্ষিত করে তোলা। এই ISA-কে আরো সক্রিয় করতে এবং অপেক্ষাকৃত তরুণী মহিলা কর্মীদের আকৃষ্ট করতে ISA-এর অধীনে অপর একটি শাখা খোলা হয় যার নাম The Feminist Theory and Gender Studies Section (FTGS)।

প্রচলিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে নারীবাদীদের সমালোচনা বা অভিযোগ : প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে নারীবাদী সমালোচকদের প্রধান অভিযোগ হল এই যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পঠন-পাঠন ও তত্ত্ব নির্মাণে নারীদের অবদানকে একেবারেই ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থিত করা হয় যেন বিষয়টি পুরোমাত্রায় পুরুষদের বিষয়। নারীদের এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেই। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক তাত্ত্বিকদের মতে, বিশ্ব রাজনীতি নারী ও পুরুষকে সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাস্তব কিন্তু তা নয়। পুরুষতন্ত্রীরা যেটা গোপন করে যান সেটি হল, রাজনীতি মহিলাদের ভিন্নভাবে ক্ষতি করে। উদাহরণস্বরূপ একটি যুদ্ধ পুরুষদের তুলনায় নারীদের অনেক বেশি ক্ষতি করে অভ্যন্তরীণভাবে, যা সাধারণের

Scanned with CamScanner

অলক্ষ্যে থেকে যায়। এই লিঙ্গভিত্তিক বিচার-বিবেচনা আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিচার-বিশ্লেষণে মোটেই প্রাধান্য পায় না, কারণ এই ক্ষেত্রটিতে পুরুষদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

নারীবাদীদের আরো অভিযোগ হল, যা আগেই বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি শুধুই যেন যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব, রেষারেষি, মরিয়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ক্ষেত্র, যা নারীদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে নারীবাদ ব্যক্তিকে বিচার করে তার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা বা অবস্থানের প্রেক্ষিতে। নারীবাদীদের মতে যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আচরণ অসম লিঙ্গভিত্তিক কাঠামোকে জিইয়ে রাখতে চায়। **কনেল** (R W Connell)-এর মতে, এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির মূলে রয়েছে আধিপত্যবাদী পুরুষতন্ত্র (Hegemonic Masculinity)। এই ধরনের পুরুষতন্ত্র নারীবাদী চিন্তনকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পক্ষে অনুপযুক্ত বলে মনে করে।

নারীবাদী লেখকদের সবচেয়ে বেশি অভিযোগ প্রাধান্যকারী বাস্তববাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে। নারীবাদী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক **টিকনার** (J A Tickner) বাস্তববাদীদের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সবচেয়ে বেশি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছেন। তাঁর মতে, 'আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রটি নৈরাজ্যজনক' (Anarchic)—বাস্তববাদীদের এই ধারণার মূলে রয়েছে হবসের প্রকৃতির রাজ্যের ধারণা, যা ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি নিরন্তর যুদ্ধের অবস্থা। **টিকনার** (১৯৯৭)-এর মতে, হবসের প্রকৃতির রাজ্য চিত্রটিতে নারীদের স্থানই নেই। টিকনার মরগেনথাউ-এর বাস্তববাদকে নিম্নলিখিতভাবে পুনর্নির্মাণ করেন :

(১) মানুষের প্রকৃতির মধ্যে পুরুষালি ও মেয়েলি প্রবৃত্তির যুগপৎ অবস্থান থাকে ; এই মনুষ্য প্রকৃতির মধ্যেই সামাজিক প্রজনন, উন্নয়ন ও রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রভৃতি উপাদানের সহাবস্থান রয়েছে।

(২) নারীবাদ বিশ্বাস করে যে, রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ গতিশীল, বহুমুখী এবং সামাজিক-ঐতিহাসিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং, জাতীয় স্বার্থের ধারণাকে শুধুমাত্র ক্ষমতার নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় না। বর্তমান দিনে জাতীয় স্বার্থ একাধিক জটিল ও ভয়াবহ সমস্যার সমাধান দাবি করে, যেমন পারমাণবিক যুদ্ধের ভীতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ দূষণ রোধ করার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

(৩) টিকনারের মতে, ক্ষমতাকে শুধু প্রাধান্য বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণের নিরিখে বিচার করলে তা পুরুষতন্ত্রীদের উল্লসিত করলেও নারী-পুরুষের মিলিত প্রয়াসে সমস্যা সমাধানের বিষয়টিকে অবহেলা করা হবে।

(৪) বাস্তববাদ ন্যায়বিচার অপেক্ষা ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়। পক্ষান্তরে নারীবাদ রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম থেকে নৈতিকতাকে বিচ্ছিন্ন করার যে-কোনো প্রয়াসের বিরোধী। নারীবাদ অনুসারে সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মেরই নৈতিক তাৎপর্য থাকে।

(৫) নারীবাদীদের মতে কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের নৈতিক উচ্চাশাকে বিশ্বজনীন নৈতিক নীতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। নারীবাদ মনুষ্য প্রকৃতির সেইসব সাধারণ নৈতিক গুণাবলির অনুসন্ধান করে যেগুলি একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব ও রেষারেষিকে প্রশমিত করবে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংহতিকে সুদৃঢ় করে আন্তর্জাতিক সমাজকে শান্তিপূর্ণ করবে।

(৬) নারীবাদ নৈতিকতা অপেক্ষা রাজনৈতিক স্বৈরাচারের কার্যকারিতাকে স্বীকার করে না। কারণ নারীবাদীদের মতে, স্বৈরাচারিতার সঙ্গে পুরুষতন্ত্র জড়িত থাকে। তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সংকীর্ণতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে বাস্তববাদ প্রকৃতপক্ষে নারীদের স্বার্থ ও অবদানের বিষয়টি উপেক্ষা করে।

(৭) নারীবাদীদের বিচারে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতিটি ধারণাই লিঙ্গভিত্তিক, অর্থাৎ পুরুষদের প্রতি পক্ষপাতমূলক। উদাহরণস্বরূপ, বাস্তববাদীদের কাছে রাষ্ট্রের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে আবার সামরিক শক্তিকে প্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। নারীবাদীরা নিরপত্তার বিষয়টির এই ধরনের ব্যাখ্যাকে 'অত্যন্ত সংকীর্ণ' বলে সমালোচনা করেন, কারণ এক্ষেত্রে মহিলাদের বিষয়টিকে সামান্যতম নজর দেওয়া হয় না। পক্ষান্তরে নারীবাদীরা নিরাপত্তা বলতে বোঝেন সমস্ত প্রকার হিংসার (দৈহিক, কাঠামোগত, বাস্তুতান্ত্রিক ইত্যাদি) অস্তিত্বহীনতা। অধিকাংশ দেশেই মহিলারা যেহেতু ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে থাকে, সেজন্য নারীবাদীরা মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। নারীবাদীরা সামরিক সামর্থ্যকে রাষ্ট্রের বাহ্যিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা হিসেবে না দেখে, বরং সামরিক

Scanned with CamScanner

বাহিনীকেই ব্যক্তি-নিরাপত্তার বিশেষ করে মহিলাদের নিরাপত্তার বিরোধী বলে মনে করেন। **পেটম্যান** (J J Pettman) বলেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সামরিক বাহিনীর গণধর্ষণের যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। নারীবাদীরা মনে করেন, যুদ্ধের ক্ষেত্রে ধর্ষণ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং অন্যতম সামরিক কৌশল। **অর্ফোর্ড** (Annie Orford) নামক অপর এক নারীবাদী জানিয়েছেন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষা কর্মকাণ্ডেও নারীদের ওপর যৌন নির্যাতনের খবর প্রকাশিত হলেও সংশ্লিষ্ট নির্যাতনকারীদের ক্ষমা করে দেওয়া হয় এই যুক্তিতে যে, তরুণ সৈনিকদের এটা একটা স্বাভাবিক জৈবিক প্রতিক্রিয়া।

সিদ্ধান্ত (Conclusion) : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে নারীবাদীদের অন্যতম প্রধান অবদান হল এই যে, তাঁদের আলোচনার মাধ্যমে আজ এটা প্রতিষ্ঠিত যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমগ্র ক্ষেত্রটি লিঙ্গভিত্তিক, যেখানে পুরুষদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। নারীবাদ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষমতাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে একটা ধাক্কা দিতে সমর্থ হয়েছে। ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির পটভূমিকায় নারীবাদী ভাবনার প্রয়োজনীয়তা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের কাছে বর্তমানে বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। নারীবাদের কল্যাণে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সুরক্ষার সংজ্ঞাটিও অনেকখানি বদলে গিয়েছে। বর্তমানে কেবলমাত্র সামরিক সামর্থ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচিত হয় না, এর সঙ্গে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত সুরক্ষাকেও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

নারীবাদীরা আরো একটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বর্তমান বিশ্বে কেবল আন্তঃরাষ্ট্র বিরোধকে হিংসার মূল কারণ বলে মনে করা হয় না, বরং হিংসার মূল কারণ জাতিগত, পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্যার মধ্যে নিহিত থাকে বলে মনে করা হয়। এই সত্যটিও নারীবাদী গবেষকদের পর্যবেক্ষণ থেকে বেরিয়ে এসেছে। বলা বাহুল্য এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসর্বস্ব পুরুষতান্ত্রিকতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেবে এটা কেউ বিশ্বাস করে না। বরং পুরুষদের ক্ষমতানির্ভর রাজনীতির পরিবর্তে নারীদের সংবেদনশীল মনোভাব বিশ্বরাজনীতির সমস্যা সমাধানে বেশি সাফল্য পাবে বলেই অনেকে মনে করেন।

নারীবাদীদের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হল, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয় নাগরিকতার ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত করা। নারীবাদ অনুসারে সক্রিয় নাগরিক বলতে বোঝায় সেইসব নাগরিককে যারা রাষ্ট্রীয় বা সরকারি কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সুতরাং একটি গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল নারীদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার যোগ্য করে তোলা। রাজনীতির পরিসর দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং পুরুষতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিসরটিকে এমনভাবে পরিবর্তন করা দরকার যেখানে নারীরাও স্বচ্ছন্দে অংশগ্রহণ করতে পারে। আর এটা ঠিক এই ক্ষমতাভিত্তিক নৈরাজ্যিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জায়গাটিতে যত বেশি মাত্রায় মহিলার অনুপ্রবেশ ঘটবে, ততই এই ক্ষেত্রটি হিংসা, রেষারেষি, স্বার্থের হানাহানি প্রভৃতি অশুভ বিষয়গুলি থেকে মুক্ত হতে থাকবে। এই পথেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়টিকে ক্রমান্বয়ে কল্যাণমুখী করে তোলা সম্ভব হবে।

Scanned with CamScanner